

সিদ্ধান্ত একটি, প্রশ্ন অনেক

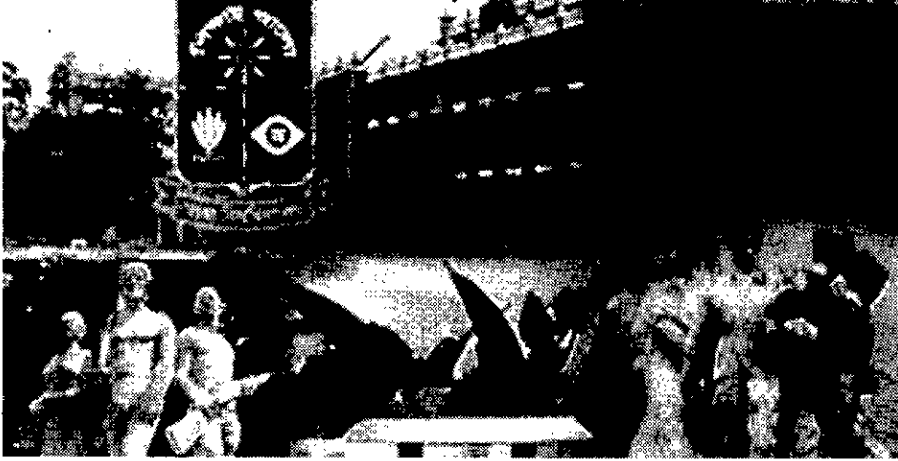
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সিদ্ধান্তের কথা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি। তাতে বলা হয়েছে রাজধানী ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছে। এ কলেজগুলো হচ্ছে— ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। গত বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে ওই কলেজগুলোর অধ্যক্ষের একটি যৌথ সভাও হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এ অধিভুক্তি কতটুকু যৌক্তিক? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির একটি বক্তব্যও ছাপা হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এতে করে কি আদৌ শিক্ষার মান বৃদ্ধি হবে? এ সিদ্ধান্তটি ভালো নয়। এবং তা শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে আদৌ কোনো সাহায্য করবে না। যতদূর জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মহব্বত খানের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করেছিল। আর ওই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্তটি নিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অধ্যাপক খান অত্যন্ত গুণী ব্যক্তি। ভালো শিক্ষক। আমরা যখন তার ছাত্র ছিলাম, শিক্ষার মান নিয়ে তিনি কখনও ‘কম্প্রোমাইজ’ করেননি। কিন্তু যে সিদ্ধান্তটি তিনি দিলেন, তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন সাবেক সদস্য হিসেবে আমার ধারণা এ সিদ্ধান্ত নানা জটিলতা তৈরি করবে। প্রথমত, ওই ৭টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আগামীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় দেবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ব্যবহার করবে। এটা কি মূল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এক ধরনের অসন্তোষ তৈরি করবে না? কেননা ওইসব কলেজে যারা অনার্স বা মাস্টার্স পর্যায়ে পড়াশোনা করবে, তাদের অনেকেই এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা ভর্তি হতে না পেরে কলেজে ভর্তি হবে। এখন কিনা তারা ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ব্যবহার করবে। এতে করে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে দু’ধরনের ছাত্র তৈরি হবে এবং ছাত্রদের মেধার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়বে। এতে উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি হবে না। দ্বিতীয়ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির পর কলেজগুলোতে পড়াবেন কারা? নিশ্চয়ই ওই কলেজের শিক্ষকরা? পরীক্ষা হবে কোন প্রশ্নপত্রে? নিশ্চয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা প্রশ্নপত্রে। এবং পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও একটা সমস্যা তৈরি হবে। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের যেভাবে পড়ান, সেভাবেই তারা প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। প্রশ্নপত্র ‘মডারেশন’ হয়। তাতে নিশ্চয়ই ওই কলেজগুলোর শিক্ষকদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে না। তাতে করে কি কলেজগুলোর ছাত্ররা এক ধরনের ‘মেধা সংকট’-এর মুখোমুখি হবে না? তারা কি ওই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে গিয়ে বামেলায় পড়বে না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র যথেষ্ট মানসম্মত। কলেজগুলোর ছাত্ররা এ মানসম্মত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বামেলায় পড়তে পারে। এতে করে তাদের উত্তরপত্রগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়িত হবে না। তৃতীয়ত, ওইসব কলেজে কর্মরত শিক্ষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির পর কি নিজেদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে দাবি করবেন? যদি করেন, কোন যুক্তিতে তাদের তা প্রত্যাখ্যান করা হবে? শিক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। তারা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্রও



খোলা জানালা তারেক শামসুর রেহমান

মূল্যায়ন করবেন? যদি তারা নিজেদের ছাত্রদের উত্তরপত্র নিজেরা মূল্যায়ন করেন, তাহলে এক ধরনের ‘বৈষম্য’ তৈরি হবে। নিজেদের ছাত্রদের ‘বেশি নম্বর পাইয়ে দেয়ার’ অভিযোগ উঠবে। এতে করে তৈরি হবে অবিশ্বাস। চতুর্থত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির এ ব্যাপারে একটি বক্তব্য থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আমার চোখে এ ধরনের কোনো মন্তব্য আমি দেখিনি। একটি সরকারি সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। শিক্ষকদের সাধারণ সভায় বিষয়টি আলোচনা করা উচিত।

অসন্তোষ তৈরি হবে, অন্যদিকে প্রশ্ন উঠবে অধ্যক্ষদের রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে। অষ্টমত, এ সাতটি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তের পর, বাকি সরকারি কলেজগুলোতেও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। যতদূর জানি প্রায় প্রতিটি সরকারি কলেজকে ধীরে ধীরে এক একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করা হবে। এটি কখনও ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এতে করে নানা জটিলতা তৈরি হবে, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সামাল দিতে পারবে না।



পঞ্চমত, কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হলে সেখানে কর্মরত শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫-তে উন্নীত করতে হবে। এখন তারা ৫৯ বছর বয়সে অবসরে যান। এখন এ ৭টি কলেজের শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫-তে উন্নীত করলে তা অন্য কলেজগুলোর শিক্ষকদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে? যষ্ঠত, খুব সঙ্গত কারণেই কলেজগুলোতে বিজ্ঞানবিষয়ক বিষয়গুলোতে ‘ল্যাব ফেসিলিটি’ কম থাকে। একটি ল্যাব বা বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সব সময় বরাদ্দ দিতে পারে না। এখন অধিভুক্তির পর কলেজগুলোর ছাত্ররা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ‘ল্যাব’ সুবিধা চায়, তাদের কি সে সুবিধা দেয়া সম্ভব হবে? যদি দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কি তা থেকে বঞ্চিত হবে না? উপরন্তু কলেজগুলোর ছাত্রদের এত বেশি সুযোগ-সুবিধা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারবে? সপ্তমত, কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হলে, ওইসব কলেজের অধ্যক্ষদের ভূমিকা কী হবে? তারা কি একাডেমিক কাউন্সিল তথা সিন্ডিকেটের সদস্য হবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তা কি মানবেন? যদি অধ্যক্ষদের কোনো ‘ভূমিকা’ না থাকে, তাহলে একদিকে তাদের মাঝে

প্রশ্নটা হচ্ছে শিক্ষার মানোন্নয়ন। যতদূর জানি প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহেই এ ধরনের সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন, এটা আমাদের জন্য ভালো খবর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে সঠিক তথ্যটি দেয়া হয়নি বলেই আমার ধারণা। দুঃখ লাগে যখন দেখি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, তার কোনো ‘ভূমিকা’ নেই। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান, আমার অতি প্রিয়জন, তিনি ব্যস্ত আছেন পত্রিকায় কলাম লিখে, তাও আবার অধিকাংশ সময় বিএনপিকে গালাগাল করে। আমি খুশি হতাম যদি তার একটি লেখাও থাকত শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে। তিনি তো কিছু উপদেশ বা ‘সাজেশন’ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। ‘শিক্ষার মানোন্নয়নের’ জন্য তিনি ইতোমধ্যে অনেক দেশ সফর করেছেন। কিন্তু সেই ‘অভিজ্ঞতা’ আমরা কোন কাজে ব্যবহার করতে পারি, তা তিনি আমাদের জানাননি। প্রধানমন্ত্রী উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তা করেন বিধায় এ সিদ্ধান্তটি হয়েছে। কিন্তু এর নেতিবাচক দিকগুলো সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করানো হয়নি। শিক্ষার মানোন্নয়ন দরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য তাই কতগুলো প্রস্তাব রাখছি। শিক্ষামন্ত্রী বিষয়গুলো নিয়ে ‘উচ্চ মহলের’ সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন। এক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীমিত

পরিসরে দুই ‘শিফট’ চালু করা হোক। দ্বিতীয় শিফট বা বৈকালিক ‘শিফট’-এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরে যাওয়া এবং কর্মক্ষম শিক্ষকদের ‘চুক্তিভিত্তিক’ নিয়োগ দেয়া হোক। প্রয়োজনে কলেজ থেকে অবসরে যাওয়া পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের এ ক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। দুই, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামো ভেঙে দেয়া হোক। ২২৫৪টি সরকারি কলেজ নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মূলত একটি সার্টিফিকেট বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলোতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। সেখানে শিক্ষক নেই। নিয়মিত ক্লাস হয় না। ছাত্ররা ঢাকার ‘বাকুসা মার্কেটে’ এসে গাইড বই কিনে নিয়ে যায়। আর ওই গাইড বই পড়েই তারা অনার্স পাস করছে। কলেজগুলোতে আদৌ কোনো ক্লাস হয় না। শিক্ষকরা সেখানে বাসায় ব্যাচের পর ব্যাচ প্রাইভেট পড়ান (আমরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা)। এটা দেখার কেউ নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবার ‘শিক্ষক’ আছেন। এরা কোনো ক্লাস নেন না। তাদের কাজ হচ্ছে উত্তরপত্র দেখা ও বিভিন্ন কলেজে মৌখিক পরীক্ষার জন্য যাওয়া। এই যে পরিস্থিতি, তা ‘শিক্ষার মানোন্নয়নের’ কথা বলে না। তিন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ভেঙে ৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। জাতীয় নেতাদের নামে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নামকরণ করা যেতে পারে। চার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। যেহেতু অবকাঠামো আছে, সেহেতু ওই অবকাঠামো ব্যবহার করে একটি নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আমরা ক্রমেই একটি সার্টিফিকেটসর্বশ্রেণী জাতিতে পরিণত হয়েছি। একশ’ ওপরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আমরা শিক্ষার মানোন্নয়ন করিনি, বরং শিক্ষিত বেকার তৈরি করেছি। এমবিএ ডিগ্রিধারী কেয়ানি তৈরি করেছি। সার্টিফিকেটধারী বেকারদের দিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন হয় না। মঞ্জুরি কমিশনকে ভেঙে উচ্চতর শিক্ষা কমিশন গঠন করতে যাচ্ছে সরকার। এ সিদ্ধান্তটি ভালো। কিন্তু দলীয় বিবেচনায় ও অযোগ্যদের এখানে নিয়োগ দিলে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হবে না। শিক্ষার মানোন্নয়ন চাই। এর জন্য দরকার যোগ্য নেতৃত্ব। একমাত্র যোগ্য নেতৃত্বই পারে শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি ভূমিকা রাখতে। পত্রিকায় কলাম লিখে, রাজনৈতিক বক্তব্য রেখে আর যাই হোক শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে না। যে ৭টি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছে, এটা হয়তো পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু ঢাকায় অবস্থিত কলেজগুলোকে নিয়ে আলাদা একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব। অবকাঠামোও আছে। প্রয়োজন সিদ্ধান্তের। আমার ধারণা এ ধরনের কোনো প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া হয়নি। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী সজ্ঞান ব্যক্তি বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে তার অবদান কতটা? সাংবাদিক ও সম্পাদক গোলাম মর্তুজা এক টিভি অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ শিক্ষামন্ত্রী হচ্ছেন আমাদের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী! তার সঙ্গে দ্বিমতের সুযোগ হয়তো আছে। কিন্তু একজন শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে মানুষ আরও বেশি কিছু আশা করে। ইউজিসির কাছ থেকে মানুষ আরও বেশি কিছু আশা করে। আমাদের দুর্ভাগ্য এখানেই, সবকিছুর জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ‘সিদ্ধান্ত’টি নিয়ে আরও আলোচনা হোক— এটাই চাই।

ড. তারেক শামসুর রেহমান : প্রফেসর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
tsrahmanbd@yahoo.com